যায়যায়দিন ... 14 AUG 2008

দেশের নারী শিক্ষার প্রসারে কিছু

ড. খ. ম. রেজাউল করিম

নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তি এবং নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষা হলো একটি শক্তিশালী চালিকা শক্তি। শিক্ষা মানুষের জন্মগত ও মৌলিক অধিকার। আর মানুষ হিসেবে এ অধিকার ভোগের সুযোগ পুরুষের পাশাপাশি প্রতিটি নারীরই কাম্য। কিন্তু আজও নারীরা সেই সুযোগ পুরো মাত্রায় পাচ্ছে না। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেকখানি পিছিয়ে রয়েছে। নারী শিক্ষা কেবল নারীর জন্য প্রয়োজন তা নয়, জাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যও তা দরকার। আজকের বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নারী শিক্ষার গুরুত্বকে কোনো মতেই উপেক্ষা করা যায় না। তাই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশও আজ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছে বলেই আগের তুলনায় এদেশের মেয়েদের শিক্ষার হার কিছুটা হলেও বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে একজন নারীর (গ্রামীণ নারীর) পরিপূর্ণ শিক্ষিত হয়ে ওঠার পথে এখনো অনেক বাধা বিদ্যমান।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষা: বর্তমান চিত্র

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটির আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯১৬ জন। প্রায় ১৩ (১২.৯২) কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত ছোট্ট এই দেশের শতকরা ৪৮.৪ ভাগ হচ্ছে নারী যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। পুরুষ ও নারীভেদে এর আনুপাতিক বণ্টন ১০৩.৮:১০০। অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে নারী-পুরুষ প্রায় সমান। তবে দরিদ্র এ দেশের নারীরা পুরুষদের তুলনায় অধিক অধিকার বঞ্চিত। এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষের অধীন। যদিও দেশের সংবিধানের ২৮(২) ধারার নারী পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার দিক থেকে নারীরা পুরুষদের সমকক্ষ নয়। বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ৬৫ ভাগ, তার মধ্যে সাক্ষর পুরুষের সংখ্যা রয়েছে শতকরা ৯০, অন্যদিকে সাক্ষর মহিলা রয়েছে শতকরা ৪০ ভাগ।

একুশ শতকের সূচনালগ্নেও বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ (৭৬.৬১%) লোক গ্রামে বাস করে। বর্তমান বাংলাদেশের গ্রাম আধুনিক যোগাযোগ, কৃৎকৌশল তথা বিশ্বায়নের প্রভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তবু গ্রাম বাংলায় নারী শিক্ষার হার আজও উদ্বেগজনক। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৬১ সালে গ্রাম বাংলায় ৫ বছর বা তদূর্ধ্ব নারী শিক্ষার হার ছিল শতকরা ১৪.৯ ভাগ। ১৯৯১ সালে এসে তা দাঁড়ায় শতকরা ১৬.৭ ভাগে। সুতরাং ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এ ৩০ বছরে নারী শিক্ষা প্রবৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা ১.৮ ভাগ। এছাড়া পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার ক্ষেত্রেও বৈষম্য বিরাজ করছে।

ব্যানবেইসের ২০০০ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা ১,৭৬,২১,৭৩১ জন। এর মধ্যে ছাত্রীভর্তি সংখ্যা ৮৫,৫৬,৭১২ জন। এ সংখ্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী মোট ছাত্রী সংখ্যার শতকরা ৯৪.৯৪ ভাগ। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ভর্তি সংখ্যা ৬,৯৮,৫০৪ জন। এর মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ৩,৯৬,৭৭৫ জন। অর্থাৎ ছাত্রীভর্তির হার শতকরা ৫৬.৮ ভাগ। এছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ভর্তি ৬৬,৮১,২১২ জনের মধ্যে ছাত্রীভর্তির সংখ্যা ৩৫,৪২,১৫০ জন এবং ভর্তির হার শতকরা ৫৩ ভাগ। ব্যানবেইসের তথ্য থেকে আরও জানা যায়, দাখিল মাদ্রাসায় ছাত্রীর হার শতকরা ৩৭ এবং দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসহ মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর হার শতকরা ৪০ ভাগ।

তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইদানীং উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রেও মেয়েরা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। তবে দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের এ অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। ইদানীং সরকার নারী শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিনা বেতনে মেয়েদের ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়া শুরু করা হয় এবং ২০০১ সালে একনেক এইচএসসি পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করে ৬০০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করে। এ কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৩৯ লাখ এবং ২০০০ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৪০ লাখ ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হয়। এছাড়াও ২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সব ছাত্রীর জন্য বেতন মওকুফ ও উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

নানাবিধ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। নিচে নারী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোচনা হলো-

দারিদ্র্য: বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রধান অন্তরায় হিসেবে দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। দেশে ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে অনেক বাবা-মা তাদের সন্তান সন্ততিদের সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া শেখাতে পারে না। প্রতিদিন দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করা যাদের জন্য কষ্টকর তাদের পক্ষে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগানো আশাতীত। তাদের সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। যাদের একটু সামর্থ্য আছে তারা ছেলে সন্তানের শিক্ষার প্রতিই বেশি আগ্রহী। কারণ আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় ধারণা করা হয় ছেলে সন্তানকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে ভবিষ্যতে সে চাকরি করে অথবা অন্য কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন করে বৃদ্ধ বাবা-মার দেখাশোনা করবে। কিন্তু মেয়ে সন্তানটিকে শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত করে তার কাছ থেকে এমন আশা কেউ করে না। কারণ মেয়ে সন্তান বড় হলে তাকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিতে হয়। বিধায় এ প্রেক্ষাপটে এদেশের দরিদ্র বাবা-মার পক্ষে ছেলে সন্তানকে শিক্ষা দেয়াটাই স্বাভাবিক। এক গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ বাবা-মা (শতকরা ৬৫ ভাগ) তাদের মেয়ে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী নন, তারা মেয়েদের শিক্ষিত করার প্রয়োজন বোধ তো করেনই না বরং একটু বড় হলেই বিয়ে দিয়ে ঝামেলা মুক্ত হতে চান।

মেয়ে সন্তানের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব: আমাদের দেশে নারী শিক্ষার পশ্চাদপদতার আরেকটি কারণ হলো জন্মলগ্ন থেকে মেয়ে সন্তানের প্রতি পিতামাতার নেতিবাচক মনোভাব। মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম বাংলায় এখনো লক্ষ্য করা যায় ছেলে সন্তান জন্ম নিলে উচ্চস্বরে আজান দিয়ে পৃথিবীতে তার আগমনকে স্বাগত জানানো হয়, অথচ মেয়ে সন্তানের প্রতি তেমনটি করা হয় না। শুধু মুসলিম পরিবারেই নয়, হিন্দু পরিবারেও এমন ধরনের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। অনেক হিন্দু পরিবারে ছেলে সন্তান জন্ম নিলে শাঁখ বাজিয়ে তাকে স্বাগত জানানো হয়। এ মানসিকতা থেকেই সন্তান প্রতিপালনের প্রতিটি পর্যায়ে অর্থাৎ সন্তানের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য বণ্টন, চিকিৎসা সর্বক্ষেত্রে মেয়ে সন্তান ছেলে সন্তান অপেক্ষা কম প্রাধান্য পায়। মূলত পরিবারের লোকজন মেয়ে সন্তানটিকে সানন্দে গ্রহণ করতে পারে না। তারা মানসিকভাবে অশান্তি ভোগ করে। একটি ছেলে সন্তান পেলে তারা যে রকম আনন্দচিত্তে আগ্রহভরে তাকে নিয়ে নানান রঙিন স্বপ্ন দেখে, একটি মেয়ে সন্তান পেলে ঠিক তদ্রূপ বিষাদ-ঘনচিত্তে তারা মেয়েটির ভবিষ্যৎ নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়ে। ছেলে সন্তানটিকে মানুষ করার জন্য প্রয়োজন হয় একজন চাকরানীর, মেয়ের জন্য তা প্রয়োজন হয় না। ছেলেটির জন্য যথাসাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু মেয়েটির জন্য তা নয়। খাবার পরিবেশনকালেও একই স্থলে ছেলে ও মেয়ে থাকলে, দেখা যায় ছেলের থালায় বড় মাছের মাথা, দুধের সর ইত্যাদি বেশি পড়লেও মেয়ের থালায় সেটা পড়ে না। তবে দুঃখের বিষয়, এ খাবার পরিবেশনে যিনি নিয়োজিত থাকেন তিনিও একজন নারী। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের সমাজে বাবা-মার কাছে ছেলে সন্তান সম্পদ এবং মেয়ে সন্তান বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়। নারী জাতির প্রতি এ ধরনের মানসিকতাই এ দেশে, বিশেষ করে গ্রাম বাংলায় নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার পেছনে অনেকাংশে দায়ী।

যৌতুক প্রথা: যৌতুক প্রথার কারণে গ্রাম বাংলার অনেক মেয়ে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষিত করে তার উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে হলে পাত্রের বাবা-মার হাতে মোটা অঙ্কের ... শেখাতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে অজুহাতে মেয়ের বাবার কাছ থেকে যৌতুকের মাধ্যমে সেই অর্থ উসুল করতে চান। কিন্তু মেয়ে যদি প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয় তাহলে যে কোনো গৃহস্থ ঘর দেখে বিয়ে দিতে যৌতুক কম লাগে। তাই অনেক দরিদ্র বাবা-মা আর্থিক লাভ-ক্ষতির হিসাব করেই তাদের মেয়ে সন্তানটিকে উচ্চশিক্ষা প্রদান থেকে বিরত রাখেন এবং অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে থাকেন।

বাল্য বিবাহ: গ্রাম বাংলায় নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার জন্য বাল্য বিবাহকেও দায়ী করা চলে। এখনো গ্রাম বাংলায় বহু স্থানে বাল্য বিবাহ নারীর জীবনে অভিশাপ হয়ে নানা রকম সামাজিক সঙ্কটের সৃষ্টি করছে। অনেক অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বাবা-মা বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। দেশের বহু স্থানে এখনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের বিয়ে দেয়ার প্রথা চালু আছে। উপরন্তু নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার কারণে এ দেশের মেয়েরা অল্প বয়সেই বয়োঃপ্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা বিবেচনায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দায় এড়ানোর প্রবণতা থেকে ১০/১২ বছর বয়সী মেয়েদের বিয়ে দিতে দেখা যায়। ফলে এ ধরনের মেয়েদের পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। এদের অনেকেই বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে মোটেও সচেতন নন। এমনকি দেশে বাল্য বিবাহ যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এ বিষয়টিও তাদের অজানা।

বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা শিক্ষক স্বল্পতা: গ্রামাঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা শিক্ষক স্বল্পতা এ দেশে নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, সার্বিকভাবে দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এছাড়া গ্রাম বাংলার অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ ও রক্ষণশীল মনের অধিকারী হওয়ায় বয়োঃপ্রাপ্ত মেয়েদের সহশিক্ষা পছন্দ করেন না। এক পর্যবেক্ষণে জানা যায়, দেশের অধিকাংশ পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা তেমন সুযোগ পায় না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না তা নয়। বেশ কিছু পরিবার দরিদ্র ও রক্ষণশীল হলেও, তারা তাদের মেয়ে সন্তানকে পড়াশোনা করাতে অগ্রহী। কারণ হিসেবে তারা বলেন, লেখাপড়া জানলে চাকরি, সম্মান, অর্থ পাওয়া যায় এবং সচেতন হওয়া যায়। এছাড়া বিগত সরকার নারীর শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% নারী কোটা নির্ধারণ করেছে। এছাড়া মেয়েদের শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। ফলে ইদানীং গ্রামের মানুষের মধ্যেও মেয়েদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ অনেকটাই বেড়েছে।

বিদ্যালয়ের অনুন্নত পরিবেশ ও অব্যবস্থাপনা: এ দেশে নারী শিক্ষার পশ্চাৎপদতার পেছনে বিদ্যালয়ের অনুন্নত পরিবেশ যেমন মেধাবী, দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব, নিয়মিত ক্লাস না হওয়া, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের উদাসীনতা ইত্যাদি অনেকাংশে দায়ী। এমনিতেই আমাদের সমাজে মেয়েদের পড়াশোনার বিষয়ে অভিভাবকদের সদিচ্ছা কম, তারপরও সার্বিক বিবেচনায় কেউ কেউ নারী শিক্ষায় উৎসাহী হলেও বিদ্যালয়ের অনুন্নত পরিবেশ দেখে পিছিয়ে আসেন।

পর্দাপ্রথা, রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় সংস্কার: আমাদের সমাজে পর্দাপ্রথা নারীর অধীনস্ততার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা কি না পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের এক সমন্বিত রূপ। পর্দা নারীর গতিশীলতাকে অনেকখানিই রুদ্ধ করে। গ্রাম বাংলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পর্দাপ্রথা, রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় সংস্কার। এ ব্যবস্থা গ্রামীণ মেয়েদের সামাজিক বিচরণের ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণে

> দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে দেশ তথা জাতির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য সবার আগে দরকার নারী শিক্ষা। কারণ নারী শিক্ষা কেবল নারীর জন্য প্রয়োজন তা নয়, জাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যও নারীকে শিক্ষিত হওয়া দরকার। একজন শিক্ষিত সচেতন নারীই পারে জাতীয় উন্নয়নকে অর্থবহ করে তুলতে।

রয়টার্স রামাল্লা

জেরুজালেমকে রাজ... ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দাবি... ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী এ... শান্তি প্রস্তাব প্রত... ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট... আব্বাসের কার্যালয় ... কথা জানানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আব্বাসের ... রুদেইনাহ রাষ্ট্রীয় ... ডব্লিউএএফএ'কে জানি... প্রস্তাব পর্যালোচনা করে... শান্তিচুক্তিতে আন্তরিক ... তিনি জানান, ও... জেরুজালেমকে রাজধা... রাষ্ট্র গঠনের দাবিটি ... জঙ্গিদের নিরস্ত্র করা ... গাজায় আব্বাস প্র... প্রতিষ্ঠার পরই কেবল ... বাস্তবায়িত হবে বলে ... করা হয়েছে।

পশ্চিমা ও ফিলি... জানিয়েছেন, এ প্র... ইসরাইল তাদের অধি... ৯২ দশমিক ৭ ভাগ এ... উপত্যকা ফিলিস্তিনকে ... জানিয়েছে।

পশ্চিম তীরের ভূমি...

...বিরোধী ...রাজি

রয়টার্স হ্যারারে

জিম্বাবুয়ের প্রেসিডে... মঙ্গলবার বিরোধী দ... ভাগাভাগি চুক্তি করে... তবে প্রধান প্রতিপক্ষ ... সঙ্গে তার এখনো সমঝ... আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট ... কথা বলেছেন।

জিম্বাবুয়েতে চলমান ... রাজনৈতিক সঙ্কট নিরস... এমবেকি। তিনি বলে... ভেঙে যায়নি এবং বিরো... ডেমোক্রেটিক চেঞ্জ ... চ্যাঙ্গেরাই এখনো তা... করছেন।

এমবেকি সাংবাদিকদের...

...হর্ন ...মানু...

...বিলম্বে আন্তর্জাতিক সহ... করা হচ্ছে। অ্যাকশনএ... পর্যায় যে পর্যায়ে পৌঁ... ...রি খাদ্য কর্মসূচি অব্যা... ...র ধারণা, শুধু খাদ্য ... বড় ধরনের বিপর্যয়ে... কল্পনা খরাজনিত কারণে... ...ম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি... প্রকট আকার ধারণ ... জনগোষ্ঠীকে রক্ষা ... জলের সরবরাহ কর... ...য় শুকিয়ে যাওয়া জল... মত, পশু চিকিৎসাসা... ...আহ্বান জানানো হয়েছে... জন্য আগে থেকেই এ... ...া হচ্ছে হর্ন অফ আফ্রি... ...নার প্রতি।

ওপরে উল্লিখিত দেশ... ...রী নতুন করে অপু... ভালোভাবে সহায়তা... ...ধরনের অবনতির ... ...ম দারিদ্র্যপীড়িত উ...